দার্জিলিঙে বৃষ্টি
কালিম্পঙে রোদ

দার্জিলিঙে বৃষ্টি
কালিম্পঙে রোদ

উদয় হাকিম

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৪২৭ মার্চ ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Darjeelingey Bristy Kalimpongey Rod by **Uday Hakim**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : March 2021
Price : 500.00
US $ 15
ISBN 978 984 95672 0 2

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি
(লোটাস কামাল)

একজন মেধাবী মানুষ।

মাননীয় মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ভূমিকা

কবিতা, নাটক, উপন্যাস এবং ভ্রমণকাহিণির মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথম তিনটি মূলত মানুষের কল্পনার ফসল। কাহিনি ও রস পাঠককে কল্পলোকে ভাসায়। যিনি লেখেন তিনি মূলত কল্পনার আশ্রয় নেন। এমনকি বাস্তব কোনো ঘটনা বা কারো ব্যক্তিজীবন নিয়ে লিখলেও সেখানে থাকে কল্পনার মিশ্রণ। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে ভ্রমণকাহিনি। ভ্রমণ মূলত বাস্তবতা এবং উপলব্ধির এক জীবনমূখী উপাখ্যান। নাটক উপন্যাস পড়ে পাঠক কল্পলোকে ভাসবেন, কিন্তু ভ্রমণ কাহিনি পড়ে বাস্তবতার ছোঁয়া পাবেন।

আধুনিক বিশ্বে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাচ্ছে ট্রাভেলগ রাইটিং বা ভ্রমন লিখনী। ভ্রমন বিষয়ক ভিডিয়ো গোগ্রাসে গিলছেন সবাই। থাকা-খাওয়ার চাহিদা মেটার পর ভ্রমণই মানুষকে বেশি টানে। তাই আগামী দিনের উপজীব্য ভ্রমণ। প্রতিটি মানুষেরই নাকি কোনো একটি নেশা থাকে। আমি চা কফি, পান বিড়ি খাই না। নেই অন্য কোনো নেশাও— কিন্তু হ্যাঁ, আমার নেশা ভ্রমণ।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দুটি শহর দার্জিলিং এবং কালিম্পং নিয়ে মূলত এই গ্রন্থ। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজদের প্রিয় জায়গা ছিল দার্জিলিং। ইংরেজি ঘরানার আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো ছিল সেখানে। ধনাঢ্য এবং অভিজাত শ্রেণির সন্তানেরা পড়তে যেতেন ওখানে। এজন্য দার্জিলিং পরিচিতি পায় বিশ্বব্যাপী। অন্যদিকে কালিম্পং বিখ্যাত পাহাড়ি শহর হিসেবে। হাওয়া বদলের জন্য সমতলের অনেকেই ওখানে যেতেন শরীর মন সুস্থ করতে। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মাঝে মাঝে কালিম্পং যেতেন। কালিম্পং নিয়ে তিনি কবিতাও লিখেছেন। কালিম্পং

থেকে আকাশবাণীতে তিনি কবিতাও পড়েছেন, যা টেলিফোনে সরাসরি রিলে করা হয়েছিল।

অন্য সবার মতো এই দুটি শহর আমাকেও টানত, ছোটোবেলা থেকেই। ধন্য যে, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল জায়গা দুটিতে যাওয়ার। যারা কখনো যাননি এবং যারা গিয়েছেন— দুপক্ষেরই বইটি ভালো লাগবে বলে আমার প্রত্যাশা।

ভ্রমণকালে ফিরোজ আলম, মিলটন এবং টিম ওয়ালটন আমাকে সব সময় উপভোগ্য মেজাজে রেখেছে— তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। অগাস্টিন সুজন বাড়ৈ, মামুন মাহাদি, আকরাম হোসেন পলাশ, জনি সোম এবং মাহফুজুর রহমান— অনুজপ্রতিম এরা কজন সর্বতো-াভাবে সহায়তা করেছে; কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতিও।

মলাটবদ্ধ করে লেখাগুলো পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশক আফজাল হোসেন এবং টিম অনিন্দ্য প্রকাশ-এর প্রতি।

উদয় হাকিম
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
ঢাকা।

সূচিপত্র

সড়কপথে ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি ১১
পৌঁছলাম স্বপ্নের দার্জিলিং ২২
দার্জিলিঙের পিস প্যাগোডা, রক গার্ডেন ৩১
দার্জিলিঙের চা-বাগান আর জুলজিক্যাল পার্ক ৩৮
দার্জিলিঙের আইনক্স ৪৭
দার্জিলিং : অদম্য ক্ষমতার অধিকারী, বজ্রপাতের শহর ৫৪
বাতাসিয়া লুপ ৬০
ঐতিহাসিক ঘুম রেল স্টেশন ৬৫
লামাহাট্টা এবং ত্রিবেণি ৭১
কালিম্পঙে পাইন ভিউ ক্যাকটাস নার্সারি ৮১
কালিম্পং : জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয় ৯০
কালিম্পঙে কাঞ্চনজঙ্ঘা ৯৬
রবীন্দ্রনাথ এবং গৌরীপুর হাউজ ১০৪
তিস্তা দর্শন ১১৬

সড়কপথে ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরের কথা। মাঠে-ঘাটে-কল-কারখানায় সবাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বিনোদন বলতে তেমন কিছু ছিল না। রেডিয়ো-টিভি সবার ঘরে ছিল না। টেলিভিশন যন্ত্র ঘরে ঘরে পৌঁছতে শুরু করে ১৯৯০ সালের পর থেকে। তখন বিনোদন বলতে ছিল গানবাজনা আর নাটক-যাত্রা।

গ্রামে গ্রামে তখন অনেক গানের আসর বসতো। কবিগান, গাজির গান ছিল খুব জনপ্রিয়। এছাড়া মুর্শিদি, ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব, লালন এবং বাউল গান ছিল মানুষের মুখেমুখে। তবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল যাত্রাপালা, নাটক। অবশ্য সভ্যতা সৃষ্টির পর থেকেই লাইভ নাটক বা মঞ্চনাটক মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রে।

'৮০-র দশকে আমি খুব ছোটো। তখন বাবাকে দেখতাম অভিনয় করতেন। সব নাটক বা যাত্রাপালাতেই রাজার ভূমিকায় দেখা যেত তাকে। গ্রামের লোকজন তাকে রাজা মশায় বলে ডাকা শুরু করল। আমাকে বলত রাজার ছেলে। যদিও আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল ঠিক এর বিপরীত।

একটি নাটক ছিল ভিখারির ছেলে। সেখানে রাজার ছেলের নাম ছিল উদয় শঙ্কর। আমার প্রতিবেশী ছিল লতিফ। সমবয়সি আমরা। চাঁদনি রাতে রিহার্সাল হতো। আমরা ওই রিহার্সাল দেখতে দেখতে সংলাপ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। ফাইনাল শো হওয়ার পর আমরা ছোটোরা সেসব অভিনয় করে দেখাতাম। তাই দেখে পাড়ার লোকেরা খুব মজা পেত।

যাত্রা-নাটকের প্রতি আমার বাবার এতটাই ঝোঁক ছিল যে, টানা ১৫ দিন হয়তো সে বাড়িতেই যেত না। আমরা কি খেয়েছি না খেয়েছি কোনো খবর নেই। কখনো হয়তো টানা সাতদিন সাতটি যাত্রাপালা বা নাটক হতো। একবার এরকম একটা নাটক হয়ে গেছে রাতে। যে বাড়িতে নাটক হয়েছে, সকালবেলা মা গিয়ে হাজির ওই বাড়ি। বাবাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। বলেছে, ঘরে কোনা খাবার নাই সে খেয়াল আছে? বাবা নাকি উত্তরে বলেছে, প্রহরী...এই তোরা কে কোথায় আছিস। সারারাত রাজভান্ডার থেকে ধনরত্ন বিলিয়ে দিলাম, তখন এই ফকিরনি কই ছিল!

যাহোক, ছোটোবেলা যেসব নাটক-যাত্রাপালা দেখেছি সেখানে রাজা-জমিদারদের একটা কমন বিষয় ছিল। দেখা যেত জমিদারের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি দার্জিলিঙে পড়ত। দার্জিলিঙে পড়া মানে জাতে ওঠা। জমিদারি স্ট্যাটাস।

শুনতাম ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা দার্জিলিঙে থাকতে পছন্দ করতেন। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে। এই ঠান্ডা, এই রোদ, এই বৃষ্টি। চা-বাগান। ছায়া গাছ। শান্ত সুবোধ পাহাড়ি জনপদ। সুখীসমৃদ্ধ নির্ভেজাল জীবনযাপন। সহজসরল মানুষ। ছিমছাম নিরাপদ বসবাস।

শুনেছি ইংরেজ সাহেবরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় থাকলেও তাদের ছেলেমেয়েরা পড়ত দার্জিলিঙে। অনেকে স্ত্রীকেও রেখে দিতেন সেখানেই। এখানকার শিক্ষার মানও ছিল ভালো। ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে তাদের কারিকুলাম আর ব্যবস্থাপনায় হতো শিক্ষা। বাংলাদেশের অনেক বনেদি পরিবারের সন্তানরাও সেখানে লেখাপড়া করেছেন। এখনো পড়ছে অনেকেই।

সেইসব শুনে মনের মধ্যে একটা দুর্নিবার ইচ্ছে— দার্জিলিঙে যাব। অবেশেষে এলো সেই সুযোগ। কর্পোরেট ক্রিকেটে ওয়ালটন অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত টি-টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও ওয়ালটন চ্যাম্পিয়ান। এর আগের বছর চ্যাম্পিয়ান হয়ে পুরো টিম নিয়ে গিয়েছিলাম ভুটান। ইচ্ছে ছিল পরেরবার চ্যাম্পিয়ান হলে দার্জিলিং যাব, সড়কপথে।

বিমানে চড়ে বিদেশে গেলে পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ থাকে না। তাই সড়কপথটাই আমার পছন্দ। রাস্তা, দুপাশের সুন্দর প্রকৃতি, নদী, পাহাড়, গাছ, ফুল এসব আমাকে খুব টানে। টিমের সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম— সড়কপথেই দার্জিলিং যাওয়ার। আরেকটা ইচ্ছে ছিল— পঞ্চগড় হয়ে বাংলাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে যাওয়ার। কারণ পঞ্চগড়ে আমার কখনো যাওয়া হয়নি।

১০ই মে সন্ধ্যায় রওনা হলাম দার্জিলিঙের পথে। শ্যামলী এনআর বাস। কথা ছিল সাড়ে ছয়টায় কমলাপুর থেকে বাস ছাড়বে। যারা কল্যাণপুর থেকে উঠবেন তাদের আসতে হবে রাত আটটার মধ্যে। কাউন্টারে একে একে টিমের সদস্যরা আসছিলেন। আমার চিন্তা শাকিলকে নিয়ে। আগেরবার কালাচানপুর থেকে এয়ারপোর্টে গিয়েছিল সবার পরে। ডিপারচার ডোর বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক সেই সময়ে ঘর্মাক্ত শাকিল হাজির। অথচ তার বাসা থেকে এয়ারপোর্ট পায়ে হাটলে পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

শাকিলকে নিয়ে যখন তুমুল আলোচনা হাস্যরস, এর মধ্যেই শাকিল এসে হাজির। কালো চেহারায় খুশির ঝিলিক। সে এসে বসল আলভির সঙ্গে। আমাদের টিমে সবচেয়ে কালো শাকিল, আর সবচেয়ে ধলা আলভি। এ নিয়ে অবশ্য শাকিলের কোনো আফসোস নেই, তার নিজের উক্তি— 'কালো হইলে কী হবে, কাটিং ভালো আছে।' দেখতে কালো, আবার বাসা কালাচানপুর, কাওলা— এসব বিবেচনায় তাকে কাওলা বলে ডাকতাম।

আমার আপন দুই মামা আছেন। একজন দেখতে কালো বলে তার নাম কালু। আরেকজন দেখতে ধলা; তার নাম ধলু। কালু মামা অবশ্য বছরদুয়েক আগে পরপারে চলে গেছেন।

আবার আলোচনায় আসলো আলভি। ইমোতে এসএমএস পাঠিয়ে কেউ একজন তার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা বাগিয়ে নিয়েছে। 'আমি ফিরোজ আলম বলছি, আমার ইমার্জেন্সি তিন হাজার টাকা দরকার। একটু জলদি পাঠান। এই আমার বিকাশ নম্বর।' ফিরোজ আলম হেসে কুটিকুটি। আমার নাম বলল আর আপনি টাকা দিয়ে দিলেন? এরকম প্রতারণার কথা আগে কখনো শোনেননি? একবার ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারতেন। আলভির ফরসা গাল লজ্জায় নীল হয়ে উঠল।

গাড়ি আসলো দেরি করে। ছাড়তে ছাড়তে রাত নয়টা। নবীনগর থেকে গাড়ি সোজা কালামপুর দিয়ে যাচ্ছে মির্জাপুরের দিকে। বাসে মোট যাত্রী ২৭ জন। তার ১৫ জনই আমরা। এই সুযোগে জমল আড্ডা। এর মধ্যে নুরুল আফসার চৌধুরী (কথায় কথায় 'ইয়া' বলে, তাই তার নাম দিয়েছিলাম ইয়া চৌধুরী) শোনাল আরেক কাহিনি। ক্রিকেট টিমের সঙ্গে ইয়া চৌধুরী ইন্ডিয়া যাচ্ছে। এই খবর বন্ধুবান্ধবী সবাই জেনে গেছে। এরই মধ্যে একান-ওকান হয়ে রটে গেছে আইপিএল খেলতে নুরুল ইন্ডিয়া যাচ্ছে!

টাঙ্গাইল শহরের একটু আগে এসে জ্যামে পড়লাম। খেয়ে দিলো প্রায় দুই ঘণ্টা। রাত আড়াইটায় গিয়ে পৌঁছলাম যমুনায়, বঙ্গবন্ধু সেতুতে। তখন অনলাইনে লাইভ দেখছিলাম বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ। কাউন্ট ডাউন করে যখন আকাশে উড়ে গেল কৃত্রিম উপগ্রহ, ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধু সেতুতে উঠলাম। সেতুর দুপাড়ে আলো জ্বলছিল লাইটপোস্টে। অন্য এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হলো মহাকাশ!

রাত তিনটে দশে গিয়ে বাস থামল সিরাজগঞ্জে, ফুড গার্ডেনে। আধাঘণ্টার বিরতি দিয়ে বাস চলতে শুরু করল। ভেবেছিলাম, পরের রাস্তাটুকু তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাব। ভোররাতে রাস্তা ফাঁকা। তা আর হলো কই। গাইবান্ধা, বগুড়া সব জায়গায় দীর্ঘ গাড়ির লাইন। বগুড়া গিয়ে প্রধান সড়ক ছেড়ে গাড়ি ছুটছিল সরু রাস্তার বাইপাস দিয়ে। আজান হচ্ছিল। একটু একটু করে ফরসা হচ্ছিল আকাশ। ভোরের আলোয় মানুষজন বের হচ্ছিল কাজে।

মেইন রোডে উঠতেই আবারও জ্যাম। দীর্ঘ গাড়ির লাইন, সময় খাচ্ছিল। লালমনিরহাট জেলায় আরেক সমস্যা। সোজা উত্তরে চলে গেছে দীর্ঘতম সড়কপথ। রাস্তা চাপা, তাতে আবার শত শত অটোরিকশা। গাড়ি স্বাভাবিক গতিতে চলার জো নেই। ঢাকার জ্যাম এখন সারা দেশেই। শিগ্‌গিরই মহাপরিকল্পনা না নিলে এই অচলায়তন ভাঙবে না।

কথা ছিল ভোরবেলা চ্যাংড়াবান্ধা পৌঁছব। তা আর হলো না। বগুড়াতেই সকাল হলো। তিস্তা সেতু পার হয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে সোজা যাচ্ছিলাম উত্তরে। দু'পাশে চরাঞ্চল। ব্যাপক ভুট্টার চাষ হয়। নিখাদ গ্রাম।

ও হ্যাঁ, আমার পরিকল্পনা ছিল বাংলাবান্ধা হয়ে যাব। কিন্তু হলো না। দলের বেশিরভাগেরই পাসপোর্টে বন্দর হিসেবে বুড়িমারি দেখানো। খেয়াল করে দেখলাম, আমারটাতেও তাই। যদিও আমার ইন্ডিয়ার পাঁচ বছরের মাল্টিপল ভিসা। কী আর করা। মন্দ কপাল ভেবে খানিকটা মন খারাপ।

আরেকটা ভুল করেছিলাম। পাসপোর্টে ইন্ডিয়ার বন্দর হিসেবে দেখানো ছিল চ্যাংড়াবান্ধা। ভেবেছিলাম বাংলাবান্ধার বিপরীতে ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা। পরে জানলাম, লালমনিরহাটের বুড়িমারির বিপরীতে চ্যাংড়াবান্ধা। যাক, তবু নতুন একটা পোর্ট তো দেখা হলো। আমি এর আগে কখনো স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কোথাও যাইনি। এই প্রথম। তবে মজার বিষয় আছে আরেকটা, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নামকরণে মিল আছে। আমাদের বেনাপোল, ওদের পেট্রাপোল; আমাদের বুড়িমারি, ওদের চ্যাংড়াবান্ধা। অনেককেই দেখেছি— কেউ যদি বলে তার বাড়ি গাইবান্ধা, মজা করে উত্তর দেয়— আমার বাড়ি ষাঁড় আলগা।

এই সীমান্তপথের কথা শুনেছিলাম সাংবাদিক বরুণ রায়ের মুখে। তিনি পাবনার বেড়ায় একটা কলেজে ভূগোলের শিক্ষক। গানও করেন। পুরো নাম বরুণ রায় সজিব। গল্পটা শুনেছিলাম সে-ও ১৫ বছর আগে।